ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর



শিবপ্রসাদ রায়

ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

কার্যালয়
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৪১৫

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৩.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
দর্পণে মুখোমুখি
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দিব্যজ্ঞান
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

ছাগলাদ্য নেতৃত্ব ও কাশ্মীর

কাশ্মীর ছিল উত্তাল এখন অগ্নিগর্ভ। এ পরিস্থিতি আকস্মিক নয়, অনিবার্য্য। ভারতের মহান বৃহৎ ছাগলাদ্য রাজনৈতিক নেতাদের সৃষ্ট। এ ইতিহাসের রূপকথা নয়, সাম্প্রতিক কালের অপরূপ কথা। জনগণ স্মৃতিভ্রষ্ট, তাই তার অনেক কথাই মনে থাকে না। রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা আত্মপ্রবঞ্চক, ভাবের ঘরে চুরি করে, জেনেও না জানার ভান করে। রাজা হরি সিং ভেবেছিলেন আমরা ভারত পাকিস্থান কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য রেখে দেবো। এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিল পাকিস্থান। রেগুলার আর্মিকে লুঙ্গি টুপি পরিয়ে উপজাতি হানাদার সাজিয়ে পাঠিয়ে দিল কাশ্মীর দখল করতে। মহারাজ বিপদ বুঝে ভারতে যুক্ত হতে চাইলেন। বৃটিশ আমলে রাজা হরি সিং একবার নেহেরুকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। সেকথা নেহেরুজী ভোলেননি। তাই সুযোগ পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন। বললেন কাশ্মীর ভারতে যুক্ত হলে শেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। কারণ তিনি কাশ্মীরের জনপ্রতিনিধি। আর আপনি সারাজীবন কাশ্মীরে প্রবেশ করতে পারবেন না। শেখ আবদুল্লা কে? মুসলীম কনফারেন্সের নেতা। একজন বিশুদ্ধ ভারতবিরোধী। মহান নেতা নেহেরুর দৃষ্টিতে ইনি হলেন জনপ্রতিনিধি। জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির প্রশ্নে জনপ্রতিনিধির প্রয়োজন হয়নি। নবাব ও নিজামের সঙ্গে চুক্তিই ছিল শেষ কথা। অন্যায় জেনেও রাজা হরি সিং সব শর্ত মেনে নিলেন। কারণ পাকিস্থানী দখলদারদের হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাতে হবে। ভারত সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করল। ভারতের বীর সৈনিকেরা তাড়িয়ে নিয়ে চলল পাকিস্থানী হানাদারদের। আর তিন চারটে দিন যুদ্ধ চললে সম্পুর্ণ কাশ্মীর মুক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু হলো বিপরীত। রাস্তা দিয়ে ষাঁড় হেঁটে চলে যাচ্ছে, তাকে খড় দেখিয়ে ডেকে এনে গুঁতিয়ে দিতে বলার মতই অপকর্ম করলেন পন্ডিত নেহেরু। একতরফা

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে গেলেন রাষ্ট্রসংঘে। উদ্দেশ্য সুবিচার প্রার্থনা। সেই উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ ভারত পাকিস্থান দুপক্ষকেই সমান দোষী সাব্যস্ত করে বিচার চালাচ্ছে আজও।

আসলে কংগ্রেস এবং নেহেরু ইচ্ছা করে অর্ধেক কাশ্মীর পাকিস্থানকে দিয়ে রেখে দিল। শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া কেউ এ ঘটনার প্রতিবাদ করেনি। সব রাজনৈতিক দল নেহেরুকে সমর্থন করেছিল। নেহেরুর এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল এক নোংরা ইতিহাস। আদুরে ভাষায় আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটু বামাক্ষ্যাপা। মেয়ে দেখলে ক্ষেপে ওঠা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কাহিনী সর্বজনবিদিত। যার সান্নিধ্য লাভের আকর্ষণে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের বড়লাট করে রেখে দিলেন মাথার ওপর। এই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন তাঁরা পুরো মাত্রায়। লেডী মাউন্টব্যাটেনের মধুর অনুরোধে নেহেরুজী অর্ধেক কাশ্মীর ছেড়ে দিলেন পাকিস্থানকে। বাকীটা করে রাখলেন অগ্নিগর্ভ। গোটা সমস্যাটা ঝুলিয়ে রাখলেন রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে। পাকিস্থান দখলীকৃত কাশ্মীর আজাদ কাশ্মীররূপে স্থায়ী হয়ে গেল। যেটা ভারতের সঙ্গে রইল তার আচরণ ভঙ্গী এমন হল যে ওটাই ভারতবর্ষে আছে কি না থাকবে কিনা সন্দেহে আমরা ভুগতে লাগলাম। যেটা উদ্ধারের কথা সেটা একেবারে ভুলে গেলাম। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্থান। ১৯৭৮ সালে পাকিস্থানের জুনিয়র ক্রিকেট টিম ভারতে খেলতে এসেছিল। প্রথম খেলা পড়েছিল কাশ্মীরে। তারা বলল কাশ্মীরে আমরা খেলতে পারি না। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ নয়। ওটা বিতর্কিত স্থান। জনতা সরকার তা মেনে নিয়ে খেলার ব্যবস্থা করল আজমীড়ে।

এদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল ছাগলাদ্য পরম্পরা। কংগ্রেসের মধ্যে এবং যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের মধ্যেও। এমন কি মার্ক্সবাদীরাও। ছাগলের মতো অদূরদর্শী এবং সর্বনাশ দেখেও বুঝতে না পারার মতো বুদ্ধি। ১৯৫০ সালে রচিত হলো সংবিধান। এই ছাগলাদ্য বুদ্ধিরই প্রেরণায় অকারণে

কাশ্মীরের জন্য প্রযুক্ত হলো ৩৭০ ধারার বিশেষ মর্য্যাদা। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টির চক্রান্তটা জনগণকে বোঝানো হলো এটাই কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারতভুক্তি। কাশ্মীরের পতাকা পৃথক, সংবিধান পৃথক, কাশ্মীরের প্রধানও পৃথক রইল। তবু দেশের নেতারা বোঝাতে চাইলেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদ করায় শুধু যুক্ত হলো এই ধারা টেম্পোরারী, অবিলম্বে তুলে দেওয়া হবে। বাস্তবিক পক্ষে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলো প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যপাল হলো সদর -ই-রিয়াসৎ। পতাকা প্রায় মুসলীম লীগের। সংবিধানও সম্পূর্ণ আলাদা। এখানেই শেষ হলো না। অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরে যেতে গেলে পাশপোর্টের মত পারমিট প্রথা চালু হল। এতবড় অন্যায় ভারতের সব রাজনৈতিক দল হাসি মুখে মেনে নিল। এছাড়াও ৩৭০ ধারার নামে সার্বভৌম একটি দেশে সৃষ্টি করা হল যুক্তিহীন বৈষম্য। যে কোনো কাশ্মীরী ভারতের যে কোনো রাজ্যে বিনা বাধায় জমি কিনতে পারবেন। কাশ্মীরে কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতিও এক ইঞ্চি জমি কেনার অধিকারী নন। সেখানে উৎকৃষ্ট বাসমতী চাল দিতে হয় আটআনা কেজি, মোটা দানা চিনি এক টাকা। এম-এ পর্য্যন্ত বিনাব্যয়ে শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সরবরাহ। সারা ভারতকে বঞ্চিত করে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেবার দায়িত্ব নিল কেন্দ্র। সাম্যের কথা যারা বেশী বলেন সেই মার্ক্সবাদীরা এই বৈষম্যকে সমর্থন করলেন। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী তখন শেখ আবদুল্লা। বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যক্তি। তিনি কখনও বলেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কখনও বলেন কাশ্মীর শুধুমাত্র কাশ্মীরীদের জন্য। একটা দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে দিয়ে ভারতকে এক ধরণের ব্ল্যাকমেল করে গেলেন সারাজীবন। ছাগলাদ্য বুদ্ধিসম্পন্ন কোন রাজনৈতিক নেতা এই ব্যক্তিকে চিনতে পারেননি।

এই ষড়যন্ত্র, শেখ আবদুল্লার এই ডবল গেম চিনেছিলেন একমাত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাশ্মীরের যথার্থ ভারতভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করল প্রজা পরিষদ। সেই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় রূপ দিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাচারী, কাশ্মীর

ভারতের অঙ্গ নয়, জনগণকে এই সত্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গেলেন। ভারত থেকে ভারতে যাওয়ার অপরাধে তাঁকে শেখ আবদুল্লার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। সত্যের স্বপক্ষে রাষ্ট্রের স্বপক্ষে একটিমাত্র কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। অজাকুলে একমাত্র ব্যাঘ্রটিকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করল শেখ আবদুল্লা এবং পন্ডিত নেহেরু। বিনা চিকিৎসায়, উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় মারা গেলেন ভারতের শেষ জাগ্রত প্রহরী। ভারতের ঐক্যের জন্য স্বাধীন ভারতে প্রথম আত্মত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। সারা দেশ দাবী জানাল শ্যামাপ্রসাদ হত্যার তদন্ত চাই। বৃদ্ধা মা যোগমায়া দেবী বিধান রায় এবং জহরলালকে চিঠি লিখলেন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত হোক্। তদন্তের দাবীতে উত্তাল কলকাতাকে স্তব্ধ করার জন্য বিধান রায় সি. পি. আইকে. ডেকে বললেন, আমি এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ট্রামে, বাসে আগুন দিয়ে জনমতকে ঘুরিয়ে দাও। কম্যুনিস্টরা তাই করল। আর মহান জহরলাল সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন—শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। লেকিন তদন্তের কথা শুনে আরো দুঃখিত। এটা বেদনায় দুঃখে আঁকা রেবতীভূষণের কার্টুনের ক্যাপশান্। তবু শ্যামাপ্রসাদের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। পারমিট প্রথা রদ হল। যে শেখ আবদুল্লা ছিল নেহেরুর জিগরী দোস্ত্ দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাকে দীর্ঘদিন জেলখানায় রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে শেখ আবদুল্লা কি করেছিলেন? একজন আদর্শ বিচ্ছিন্নতাবাদীর যা করণীয়। ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা তাঁকে তোল্লাই দিয়ে কাশ্মীরের সমস্যায় জলসিঞ্চন করেছেন। আজও এরা সবাই একই লাইনে। তাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানও সুদূর পরাহত। পাকিস্থান কিন্তু অর্ধেক কাশ্মীর দখল করে নিশ্চিন্ত থাকেনি। বাকীটা দখলের জন্য অনুপ্রবেশ, গুপ্তচর সংগঠন, অন্তর্ঘাতের ট্রেনিং দেওয়া, প্যান্ ইসলামকে আগ্রহী করে তোলা এবং বিশ্বজনমত তৈরী করতে থাকল তাদের অনুকূলে। ১৯৫৭ সালে পাকিস্থান কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন করল রাষ্ট্রসঙ্ঘে। দাবী কাশ্মীর পাকিস্থানে যুক্ত হওয়া উচিত। ভারতের

পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেনন। ভারতের পক্ষে তিনি টানা আটঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে অজ্ঞান হয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তারপর বক্তৃতা করলেন পাকিস্থানের প্রতিনিধি জাফরুল্লা খান। মাত্র পাঁচ মিনিট। পরে বিষয়টি ভোটে দেওয়া হলে সমস্ত সদস্য ভোট দিল পাকিস্থানকে। কৃষ্ণমেননের এই দীর্ঘ ছাগলাদ্য বক্তৃতার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। এটাই স্বাভাবিক। ছাগলাদ্য শব্দটি অর্থবহ। কবিরাজরা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত তৈরী করেন প্রজনন ক্ষমতাশূন্য ছাগল দিয়ে। ভারতের ছাগলাদ্য নেতারা তাই কিছু সৃষ্টিতে অক্ষম। হারানো, ধ্বংস, আত্মাঘাতে এদের দারুশ সক্ষমতা। তাই সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর পাকিস্থানে চলে যাচ্ছিল কৃষ্ণমেননের কৃতিত্বে। ভেটো প্রয়োগ করল রাশিয়া। তারা বলল কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ভারতেই থাকবে। আজ অগ্নিগর্ভ হয়েও যেটুকু কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে আছে বলা হয় এটা রাশিয়ার দয়ায়। রাশিয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়েছিল অকারণে নয়, তার জাতীয় স্বার্থে। কাশ্মীর পাকিস্থানে গেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্মিত হবে মার্কিন ঘাঁটি। রাশিয়ার শিয়রে শমন চলে আসবে। এই কারণে কাশ্মীর রয়ে গেল ভারতে।

রাশিয়ান প্রতিনিধিরা কৃষ্ণমেননকে বললেন এভাবে আপনারা কাশ্মীরকে কতদিন ভারতে রাখতে পারবেন? ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ করে দিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক লাখ হিন্দু এনে কাশ্মীরে বসিয়ে দিন। জনসংখ্যার অনুপাত বদল হলেই কাশ্মীরে ভারসাম্য ফিরে আসবে। ভারতের সমস্যা এবং সমাধান রাশিয়া বোঝে এবং সৎ পরামর্শ দেয়। ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভ জহরলালকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। আপনি ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন না কেন? এরপর কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এই কঠিন সত্য বাক্যেও কর্ণপাত করলেন না পন্ডিত জহরলাল নেহেরু। ভারতের কাঁধে চিরকালের জন্য চাপিয়ে দিয়ে গেলেন কাশ্মীর সমস্যাকে। ইন্দিরা গান্ধী ৭৯র নির্বাচনে কাশ্মীরে গিয়ে বলে এলেন, ৩৭০ ধারা আমরা প্রবর্তন করেছি। আমরা কি তুলতে পারি? ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই বিচিত্র দেশ

যেখানে প্রধানমন্ত্রীরাও ভোটের তুচ্ছ স্বার্থে ঐক্যবিরোধী সংবিধান বিরোধী উক্তি করতে পারেন। ৩৭০ ধারা একটি সাময়িক চুক্তি। তার অস্তিত্ব দীর্ঘ করা মানেই কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারতভুক্তি না হওয়া। এই সব ঘটনা নির্বিচারে চালানোর নাম এখন রাজনীতি। কাশ্মীর একটা পরীক্ষাক্ষেত্র ছিল মুসলমানদের কাছে। তারা যে সত্যি ভারতীয় অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ তার প্রমাণ দিতে পারতো একজন হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী করে। কোনো রাজনৈতিক কর্মীর মনে এ প্রশ্ন জাগে না। তার কারণ এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা ও কর্মীরা ছাগলের মত শুধু সামনের খাদ্যটুকু দেখতে পায়। দূরের সর্বনাশ চোখে পড়ে না। এদেশের সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও একই দোষে দুষ্ট। এর পিছনে অবশ্য আছে দুটি কারণ। এক, কিছু ব্যক্তি আত্মবিক্রয় করেছেন পেট্রোডলারের কাছে। তারা ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের গতি প্রকৃতি উদ্দেশ্য বিধেয় সব জেনেও কিছুই বলবেন না। সব ঘটনার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক বিচিত্র বিশ্লেষণ করে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্যকে আড়াল করবেন। অন্য বড় গোষ্ঠীটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পারার কারণ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। কোরাণ হাদিসে অমুসলমান মানুষ এবং অমুসলমান দেশের জন্য মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য কি তা না জানা। কাশ্মীর সম্পর্কে আগাগোড়া ভুল নীতি অনুসরণ করার এও অন্যতম কারণ। শেখ আবদুল্লার মত একজন রাষ্ট্রদ্রোহী যিনি সর্বতোপ্রকারে দেশের ক্ষতিসাধন করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকের মুক্তকচ্ছ আবেগ দেখেই পেট্রোডলার এবং অজ্ঞতা নামক ব্যাধিটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এমন কোনো গুণবাচক শব্দ ছিল না যা তাঁর নামের সঙ্গে সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক নেতারা যুক্ত করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্তি, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, শের-ই-কাশ্মীর, কাশ্মীরের পিতা। নিজের পিতৃবিয়োগে এতটা ব্যাথাকাতর দেখা যায় না মানুষকে, যতটা শেখ আবদুল্লার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হয়েছিল।

অথচ এই আবেগ ছিল মিথ্যে, উচ্ছ্বাস ছিল কৃত্রিম। সকলেই জানেন তিনি একটুও ভারতপ্রেমী ছিলেন না। কাশ্মীর ভারতে যুক্ত হোক এতে তাঁর মোটেই

ইচ্ছা ছিল না। জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী শাহনওয়াজ ভুট্টোর মত শেখ সাহেব জিন্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে যাচ্ছিলেন। শাহনওয়াজ ভুট্টো হচ্ছে জুলফিফার আলি ভুট্টোর পিতা এবং বেনজির ভুট্টোর ঠাকুরদা। সর্দার প্যাটেল জুনাগড়ে সেনা পাঠালে শাহনওয়াজ ভুট্টো পাকিস্থানে পালিয়ে যান। তখন ষড়যন্ত্রের নথিপত্র পাওয়া যায়। শাহনওয়াজ অফিসিয়ালি ভারতে যুক্ত হবার জন্য সরকারের সাথে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন,অন্যদিকে গোপনে জুনাগড়কে পাকিস্থানের হাতে তুলে দেবার পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন। কাশ্মীর দখল করে শেখ সাহেবকে ক্ষমতায় বসাতে হবে এই নিশ্চয়তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জিন্না। পাকিস্থান কাশ্মীর অধিকার করলে শেখ আবদুল্লার শুধু স্বপ্ন সমাধি নয়, সারাটি জীবন হয়তো পাকিস্থানের জেলখানাতেই কাটাতে হতো। তাঁর লোকদেখানো ভারতপ্রীতির এটাই আসল রহস্য।

কাশ্মীরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কতটা খাঁটি তারও প্রমাণ রয়েছে তদানীন্তন ঘটনায়। পাক হানাদার বাহিনী যখন শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসছে শের-ই-কাশ্মীর তখন শেয়ালের মতই লুকিয়ে বিমানে চড়ে পালিয়ে এলেন ইন্দোর। তাঁর শালার কাছে। তাঁর শালা হোলকারের মহারাজার কাছে চাকরী করতেন। ভারতীয় ফৌজ না পৌছানো পর্য্যন্ত অধ্যাপক বলরাজ মাধোক তাঁর কলেজের কয়েকশো ছাত্রকে নিয়ে শ্রীনগর রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ভারতীয় বাহিনী পাক হানাদারদের যখন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন শেখ শ্রীনগরে ফিরে এলেন। ৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর ফিরেই তিনি একটি সভায় বললেন ঃ "কাশ্মীরের রাজার মুকুট আমরা ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছি। আমরা ভারতে যাব কি পাকিস্থানে সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে।" উজ্জ্বল অন্ধকারের মত শেখ সাহেবের আরো ইতিহাস আছে। তাঁর আমলেই কাশ্মীরে গীতা নিষিদ্ধ হয়েছিল। পাশ হয়েছিল পুনর্বাসন বিল। ১৯৪৮ সালে বেহেস্তে বাসের বাসনা নিয়ে যারা স্বেচ্ছায় পাকিস্থানে চলে গিয়েছিল তাদের জমি সম্পত্তিসহ নাগরিকত্ব দিয়ে পুর্নবসতি দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরের যে

অংশটা পাকিস্থান দখল করে রেখেছে সেটা উদ্ধারের কথা শেখ আব্দুল্লা কোন দিন বলেননি। এই বিলে পাকিস্থান থেকে দলে দলে মুসলমানদের চলে আসার আইনী ব্যবস্থা করা হল। উড়িষ্যার প্রাক্তন আই জি মিঃ এস. কে. ঘোষ একটি বই লিখেছেন ঃ মুসলীম ইন্ ইন্ডিয়ান পলিটিকস্। ল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে বইটা প্রকাশিত। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ এই বিলের ফলে এয়ার মার্শাল আসগর খানও এখন শ্রীনগরে এসে নাগরিক হতে পারেন, যিনি বলেছিলেন শ্রীনগর দখল করতে না পারলে বম্বিং করে ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। কাশ্মীরের সংবিধানে আছে কোনো কাশ্মীরী দশ বছর কাশ্মীরের বাইরে থাকলে তার নাগরিকত্ব চলে যাবে। অথচ পাকিস্থানের লোকদের কাশ্মীরে এলে নাগরিকত্ব দেবার জন্য এই সাংঘাতিক বিলটি পাশ করানো হলো। অবাক হবার মত ঘটনা, ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় হাজার বিশেক হিন্দু পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরে। এখন তাদের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার। এরা আজ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের নাগরিকত্ব পায়নি। নিজের নামে জমি কিনতে পারে না। ব্যবসা করতে পারে না। বিধানসভার ভোট দিতে পারে না। লোকসভায় ভোট দিতে পারে। তারা ভারতের নাগরিক কিন্তু কাশ্মীরের নাগরিক নয়। কাশ্মীরে তারা অবাঞ্ছিত উৎপাত। ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যতীত এই বিল এবং এই অবস্থাকে সব রাজনৈতিক দল সমর্থন করে। সাংবাদিক বুদ্ধিজীবিরাও এ বিষয়ে প্রতিবাদমুখর নয়। এই রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবিদের ছাগলাদ্য বুদ্ধির অধিকারী বিশেষণ যথার্থ বলেই মনে হয়। শেখ সাহেব আরো একটি কাজ করে গেছেন যা অনেকে ভাবতেই পারেন না। তিনি রেশন ব্যবস্থাতেও বৈষম্য ঘটিয়েছেন। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা রেশন কম পাবে। জম্মু-কাশ্মীরে প্রতিটি হিন্দু, মুসলমানদের অপেক্ষা রেশনে মাল কম পায়। এটিও প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অভিযোগ জম্মুর নির্বাচনী সভায়। প্রতিকার তাঁর হাতে ছিল, তা কিন্তু করেননি। অভিযোগটি তুললেন হিন্দু ভোট পাবার জন্য।

ফারুক আবদুল্লা আর এক বিতর্কিত ব্যক্তি, যিনি লন্ডনের নাগরিক। বাবার

আগ্রহে ভারতে এসে এম-পি হয়ে গেলেন, কিন্তু ভারতের নাগরিক নন তখনও। অনেক পরে নাগরিক হয়েছেন। সেটাও ভারতীয় জনতা পার্টির সোরগোলের ফলে। অন্য দলগুলি এ বিষয়ে ছিল নির্বাক। তারপর ফারুক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হলেন। আসলে প্রধানমন্ত্রী। আজও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীদের বলা হয় "উজিরে আজম্" মানে প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীরের বেতার এখনও আকাশবাণী নয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও নয়, রেডিও কাশ্মীর। ফারুকের আমলে পাকিস্থানী পতাকা উড়তে লাগল বেশী করে। চোদ্দই আগষ্ট পালিত হতে থাকল পাকিস্থানের স্বাধীনতা দিবস। কাশ্মীরের যেখানে সেখানে। খালিস্থানীদের ট্রেনিং সেন্টার তৈরী হলো বিভিন্ন স্থানে। ষ্টেডিয়ামে ফারুকের উপস্থিতিতে ভারত ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলার সময় পাকিস্থানী পতাকা দেখানো এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের পচা ডিম ছুঁড়ে মারা হলো। দুবছরে তিনশো হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হলো। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা আশোক সিংঘল ফারুকের সঙ্গে দেখা করে এবিষয়ে বলতে তিনি বললেন ঃ মন্দির তৈরি করলে যখন মুসলমানেরা ভেঙে দিচ্ছে তখন আবার নতুন মন্দির তৈরী করবার দরকার কি? ধর্মনিরপেক্ষ বাপের উপযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ ছেলে। এইরকম একজন হিন্দুধর্ম বিদ্বেষীকে কাঁধে তুলে নাচানাচি করল ভারতের সব বিরোধী দল। মার্ক্সবাদীরা মুসলীম ভোট সংগ্রহের জন্য নির্বাচনের সময় তাকে কাজে লাগালো। রাজীব গান্ধী তার সঙ্গে আঁতাত করে কাশ্মীরে ক্ষমতার ভাগীদার হলেন। ফারুক সাহেবের বায়না ছিল কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি অন্য রাজ্যের হলে চলবে না। কাশ্মীরী এবং অবশ্যই তিনি মুসলমান হবেন। এরপর কে অবিশ্বাস করবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়?

এই হচ্ছে আমাদের রাজনীতি। বিশুদ্ধ এবং বৃহৎ ছাগলাদ্য রাজনীতি। এখন একটা ছেলেমানুষেও জানে কাশ্মীর পরোপুরি পাকিস্থানের নিয়ন্ত্রণে। যিনি কাশ্মীরকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন, পাকিস্থান এবং তার তাঁবেদার দলগুলির ইচ্ছায় সেই জগমোহনকে কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো। পাকিস্থানের রাস্তায় মিছিলে মিছিলে শ্লোগান দেওয়া হলো জগমোহন,

ভাগমোহন। সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়ে গেল ভারতে। সব দলের আগ্রহে। কাশ্মীরে প্রতিটি মসজিদ থেকে অহোরাত্র ভারত বিরোধী অর্থাৎ হিন্দুবিরোধী প্রচার চালানো হয়। হিন্দুবিরোধী বক্তৃতার টেপ চালিয়ে টেপরেকর্ডার বেঁধে দেওয়া হয় কুকুরের গলায়। তবু ভারতীয় শব্দটি কাশ্মীরে সম্পূর্ণ নয়। ভারতীয় কুত্তা বললে তবে সম্পূর্ণ হয়। কাশ্মীরে ভারতীয় সময় বাতিল। পাকিস্থানের সময় অনুসরণ করা হয়। ভারতের অপেক্ষা পাকিস্থানের ঘড়ি একঘন্টা এগিয়ে থাকে। কাশ্মীরেও তাই। হিন্দু বিবাহিতা মহিলাদের সিঁদুর পরা চলবে না। সবাইকে বোরখা পরতে হবে। পাকিস্থানের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককে ডানহাতে ঘড়ি বাঁধতে হবে। বাঁহাতে বাঁধলে প্রাণ দিতে হবে। নমস্তের বদলে আদাব এবং শ্রীর বদলে জনাব ব্যবহার হবে। দূরদর্শনে মহাভারত প্রদর্শনের সময় কাশ্মীরে মহাভারত দেখা অপরাধ ছিল। দেখলে প্রাণদন্ড। তিন লক্ষাধিক হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে প্রাণটুকু মাত্র নিয়ে পালিয়ে আসতে হল। তখন তো আরো এগিয়ে গেছে উগ্রপন্থী মুসলীম যুবকেরা। তারা ইস্তাহার ছাপছে ইংরাজী ভাষায়। তার বিষয় হচ্ছে ঃ **হিন্দু যদি কাশ্মীরে নিরাপত্তা চাও তাহলে তোমাদের মেয়েদের আমাদের হাতে তুলে দাও।** সংবাদপত্রে নিত্য এইসব সংবাদ পাঠ করছেন সকলেই। তথাপি এদেশের রাজনৈতিক নেতা এবং পন্ডিত বুদ্ধিজীবিরা বলছেন কাশ্মীর সমস্যা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। হিন্দু মুসলমানের কোনো ব্যাপার নেই। র‍্যাডিক্যাল নেতা বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি. এম. তারকুন্ডে একদল বুদ্ধিজীবিকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর ভ্রমণ করে এসে বিবৃতি দিলেন, কাশ্মীরে বাস্তবিক পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করেছে R. S. S. এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই ছাগলাদ্য বুদ্ধিজীবিদের তৈরী করা কৃত্রিম পরিবেশ থেকেই গোলা জনগণের একাংশ মন্তব্য করেন এসব হচ্ছে রামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণের জন্য। যেন এর আগে কাশ্মীর ছিল ঝিলম নদীর মত নিস্তরঙ্গ। চেনার গাছগুলির মত শান্ত নিস্তব্ধ। সি পি এমন সাইফুদ্দিন চৌধুরী, এম-পি প্রতিটি সভায় বলছেন, আমি কাশ্মীরে গিয়ে দেখে এসেছি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। রাত জেগে মুসলমানেরা

হিন্দুদের বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। ঐক্য পাহারার ঠেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু পালিয়ে আসছে কাশ্মীর ছেড়ে। তথাপি এদেশের জনগণকে এই ধরণের কথা শুনতে হয়।

আর এক র‍্যাডিক্যাল লেখক গৌরকিশোর ঘোষ ঘটনার দশমাস পরে ভাগলপুরে গেলেন মনুষ্যত্বের সন্ধান করতে। ক্ষেত্র শুধু মুসলমান পাড়াগুলি। মুসলমানেরা কিভাবে হিন্দুদের বাঁচিয়েছে তার বিবরণ। রামশিলার মিছিল প্রথম আক্রমণ করে মুসলমানেরা, ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলে আনসারী নামে এক গুণ্ডার মুসলমান গুণ্ডার নেতৃত্বে ৪৫০ জন হিন্দু ছাত্রকে হত্যা করা হয়। একথা তিনি উল্লেখের প্রয়োজন মনে করলেন না। এই হচ্ছে এদেশের মহান সাহিত্যকারের মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান।

কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রাক্তন স্বরাষ্টমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ থেকে শুরু করে অনেকেই বোঝাতে চেয়েছেন কাশ্মীরের সমস্যা হিন্দু মুসলমান সমস্যা নয়। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। বেছে বেছে হিন্দু হত্যা হিন্দু মন্দির ধ্বংস হিন্দু বিতাড়ণ দেখেও প্রকৃত সত্য কেউ উচ্চারণ করছেন না। মৌলভী ফারুকের মত দুচারজন মুসলমান মরছে ঠিকই, সেটা কিন্তু তাদের ভারতপ্রীতির জন্য নয়। ওটা হচ্ছে পাকিস্থানপন্থী এবং স্বাধীন কাশ্মীরপন্থীদের আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ফল। ভারত কিন্তু দুপক্ষেরই সমান দুশমন। ভারতের মূল সমাজ এটি বুঝতে অক্ষম। তার কারণ ইসলাম সম্পর্কে শুধু তাদের অজ্ঞতাই নয়, নিজেদের আরোপিত ধারণার স্বরচিত অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত। ইসলাম বা ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণার পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মানসিকতা। ইসলাম ধর্মীয় নয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের এক মারাত্মক অস্ত্র। ধর্মের আড়ালে সাম্রাজ্য বিস্তার ইসলামের মূল লক্ষ্য। যুদ্ধের মাধ্যমে জোর করে কোনো দেশ বা জাতিকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনা ধর্মীয় আদেশ হিসাবে সকল মুসলমানের দ্বারা স্বীকৃত। শুধুমাত্র এই কারণে সকল মুসলীম রাষ্ট্র স্বাধীন কাশ্মীর অথবা পাকিস্থান অনুগত কাশ্মীরের অন্ধ সমর্থক। এদেশের মুসলমানদের একটি সংগঠনও কাশ্মীর বিষয়ে প্রতিবাদ করেনি। মৌলানা বুখারী প্রমুখ কিছু মুসলীম নেতা প্রকাশ্যে কাশ্মীরের

স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রকৃত মনোভাবের অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে ভারতের অধিকাংশ মুসলমান কাশ্মীর প্রশ্নে পাক মনোভাবের পক্ষে। অথচ এদেশের ছাগলাদ্য রাজনৈতিক পরম্পরায় কোনো সরকার সত্যবাক্য ঘোষণা করতে পারে না। স্পষ্ট ভাষায় সকল মুসলীম এবং মুসলীম রাষ্ট্রগুলিকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ঃ কাশ্মীরে মুসলমানরা যদি ভারতকে মাতৃভূমি হিসাবে মেনে না নিতে পারে তাহলে দেশভাগের পর এদেশে যে সমস্ত মুসলীম রয়ে গেছেন তাদের পত্রপাঠ পাকিস্থানে চালান করা হবে। কারণ তারা পাকিস্থানের পক্ষ নিয়ে ভারতে বসবাস করবে এটা সহ্য করা যায় না। এই একটি বাক্য উচ্চারণে ভারতের রাজনীতির স্থিতিশীলতা ফিরে আসত। পাকিস্থান ভারত আক্রমণের উন্মাদনার পরিবর্তে উদ্বাস্তু আগমনের আশংকায় সংযত থাকত। আমরা সত্যি সত্যি পাকিস্থানকে বন্ধুরূপে পেতাম। কিন্তু আমাদের রাজনীতির সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে। সত্যের সঙ্গে নয় আত্মপ্রবঞ্চনার সঙ্গেই আমাদের রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেও আমরা তা মেনে নিতে পারি না। নিরাপত্তার দিক দিয়ে চিন্তা করলে কাশ্মীরের অবস্থান আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিমালয়ের পশ্চিমে বিমানঘাঁটি হিসাবে কাশ্মীর উপত্যকার কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্থান যেহেতু চিনের অনুচর সেহেতু পাকিস্থান কাশ্মীর হাতে পেলে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে। সুতরাং কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সরকার যার বিন্দুমাত্র দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে সে কিছুতেই কাশ্মীর হাতছাড়া করবে না কিংবা স্বাধীন কাশ্মীরের দাবী মেনে নেবে না। কাশ্মীরের জনগণ কি ভাবছে তা আমাদের ভাবার প্রয়োজন নেই। যারা ভারতে থাকতে রাজী নয় তারা স্বচ্ছন্দে পাকিস্থানে চলে যেতে পারে, আমরা বাধা দেব না। কিন্তু কাশ্মীরের বা ভারতের সূচ্যাগ্র ভূমিও আমরা ছাড়ব না। এই সহজ সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবাই কাশ্মীরের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছেন। কাশ্মীর সমস্যার

সমাধান চাইলে বৃহৎ ছাগলাদ্য রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে মুক্তি নিতে হবে, সেইসঙ্গে কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ইসলামের গতি প্রকৃতির আলোকে বিচার করতে হবে। তবেই ঘটবে সমস্যা সমাধানের নামে অলীক কল্পনার অবসান। মনে রাখতে হবে পাকিস্থান সরকারই শুধু কাশ্মীরে সাহায্য দেয় না, জনগণও চাঁদা তুলে পাঠায়। ইরান আমাদের কি ঘনিষ্ট বন্ধু ! বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম না পড়েই আমরা রুশদির লেখা স্যাটানিক ভার্সেস নিষিদ্ধ করে দিলাম। খোমেনির মত একটি ব্যক্তির মৃত্যুতে সাতদিন রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হলো। কাশ্মীর প্রশ্নে ইরান কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে। আফগানিস্থানের মুজাহিদিনরা গেরিলা হিসাবে কাশ্মীরে এসে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছে। দুএকটি আরব রাষ্ট্র পাকিস্থানের পক্ষে নয় বলে যে সরকারী প্রচার চলছে তা নেহাৎই আত্মপ্রবঞ্চনাঘটিত আত্মপ্রসাদ। সকলের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ্যে প্রকটিত হয়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘে। ১৯৫৭ সালে কৃষ্ণমেননের বক্তৃতার পর। এরপরেও যারা প্যান ইসলামের লক্ষ্যকে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাতে পারছেন না তাদের একটি গুপ্ত হ্যান্ডবিলের কথা জানা উচিত। কাশ্মীরে এটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত। প্রচারক জামাতে ইসলামী। তাতে পরিষ্কার লেখা হয়েছেঃ আমাদের শত্রুতা হিন্দুস্থানের সঙ্গে। এতে কি ভাবে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে হবে, আতংক সৃষ্টি করতে হবে, হত্যা করতে হবে তার ব্লুপ্রিন্ট আছে। পুরো অভিযানটির সাংকেতিক নাম অপারেশন টোপাক। এতে আছে আমরা একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্ররূপে কাশ্মীরকে দেখতে চাই। আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম। খোদার ফজলে আমাদের কাছে আধুনিকতম অস্ত্রের ভান্ডার আছে। আমাদের কাছে এমন কিছু তরুণ আছে যারা হিন্দুস্থানের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এরা গ্রামে গ্রামে প্যালেষ্টাইনী মুক্তিযোদ্ধা বা আফগান মুজাহিদদের মত গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাবে। চীনের বন্ধুরা যথাসময়ে চীন-ভারত সীমান্তে গন্ডগোল করে হিন্দুস্থানী সেনাদের ব্যস্ত করে রেখে দেবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের সঙ্গে মুখোমুখী

যুদ্ধে আমরা কোনদিন পারব না। চোরাগোপ্তা অন্তর্ঘাত, সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, হঠাৎ সেনাবাহিনীর ওপর আঘাত, হিন্দু সরকারী অফিসারদের হত্যাকান্ড চালিয়ে যেতে হবে। একেবারে শেষে লেখা, আমাদের উদ্দেশ্য ঃ ইসলাম হ্মারা মকসদ হ্যায়, কুরাণ হামারা দস্তুর হ্যায়, জিহাদ হামারা রাস্তা হ্যায়। মানে ইসলাম আমাদের লক্ষ্য, কোরাণ আমাদের পাথেয়, জিহাদ মানে নিরন্তর অমুসলমানদের নিধন করা আমাদের পথ। এই হ্যান্ডবিলের বিবরণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ হিন্দী ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি ছাগলাদ্য বুদ্ধিজীবি ও নেতারা মিথ্যার প্রতিযোগিতায় একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে জনগণকে বুঝতে দিতে চায় না কাশ্মীরের প্রকৃত অবস্থাটিকে। অতীতের চক্রান্ত এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা জেনেও দেশকে ঠেলে দেয় সর্বনাশের দিকে। ফারুকের প্রথম মন্ত্রীসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান আতাউল্লা সুরাবর্দী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আমরা কাশ্মীরীরা ইচ্ছা করলেই পাকিস্থানে যুক্ত হতে পারতাম। পাকিস্থানে যুক্ত না হয়ে আমরা হিন্দুস্থানে এলাম কেন? গোটা দেশকে পাকিস্থান বানাবো বলে। তারও আগে থেকে শকুনির দৃষ্টি ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার। এখন প্যান্-ইসলামের সহযোগিতায় কাশ্মীরকে লেবাননের পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লেবাননের পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে ভারতের চিরস্থায়ী মাথা ধরার বিষয় হয়ে উঠবে কাশ্মীর। আর সে ব্যাধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করা যাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র। এখনই প্রায় লেবাননের মত পরিস্থিতি কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে। সমস্যাকে সঠিকভাবে তুলে না ধরে বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতারা শৈথিল্য এবং উদাসীনতা দেখিয়ে কাশ্মীর নিয়ে গোটা দেশকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। এ এক অসহনীয় অবস্থা। যাদের মধ্যে দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আছে এবং সমস্যাটি সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন তাদের রক্তে কিন্তু আগুন ধরে যাচ্ছে। ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রাক্তন কর্ণেল জে. কে. দত্ত অস্থির হয়ে লিখেছেন কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের চরমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। অবিলম্বে ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ করে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এনে কাশ্মীরে বসবাসের ব্যবস্থা করতে

হবে। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্মূল করে দিতে হবে। এটা না পারলে কাশ্মীর ছেড়ে দেওয়া হোক্। হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহীদের পালন পোষণ করে কাশ্মীরকে লেবানন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যে কোনো সুস্থ ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র সূত্র ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ। পেটে টান পড়লে বিপ্লব অনেকটা ম্রিয়মান হয়ে যাবে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষ হিন্দু কাশ্মীরে এলে জনসংখ্যার ভারসাম্য ফিরে আসবে। অন্যান্য রাজ্যের মত কাশ্মীর তখন শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে। নইলে কাশ্মীরের ক্ষত সম্প্রসারিত হবে। হবে না, হতে শুরু হয়েছে। নাগাল্যান্ডে, মিজোরামে ৩৭১ ধারা যুক্ত হয়েছে। মিজো ছাড়া, নাগা ছাড়া ওখানে কেউ নিজের নামে জমি কিনতে পারে না, ব্যবসা করতে পারবে না। মেঘালয় ৩৭১ ধারার জন্য দাবী জানাচ্ছে। এইসব প্রদেশে অন্য রাজ্যের লোকেদের বসবাস অনিশ্চয়তায় আশংকায় দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে। নিকট ভবিষ্যতে এইসব রাজ্য হয়ে উঠবে এক একটি কাশ্মীর। এই সব অঞ্চলগুলিতে অন্য একটি সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় রয়েছে। খ্রীষ্টিয় সাম্রাজ্যবাদ। মুসলমানের সংখ্যা, খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়লেই সেখানে ভারত বিরোধিতা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিচ্ছে, এই সরল সত্যটি এদেশের ছাগলাদ্য নেতৃত্বের অনুভবে কিছুতেই আসছে না। ভারতকে যারা এখনও এক রেখেছে ও রাখতে পারে সেই হিন্দু সমাজ সংগঠিত হলে, শক্তিশালী হলে এই ছাগলেরা আতংকবোধ করছে।

কাশ্মীর যে আক্ষরিক অর্থে ভারতের নয় এবং এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি কাশ্মীরকে ভারতে রাখতে চায় না, তার শেষতম প্রমাণ বিদ্যার্থী পরিষদের কার্য্যক্রম। ভারতের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদ শ্রীনগরে জাতীয় পতাকা তুলতে চেয়েছিল। তাদের পতাকা তুলতে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের মাথাব্যথা নেই। কোনো অপমানবোধ নেই। মোর্চা সরকার গঠিত হবার পর কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি সর্বদলীয়

সম্মেলন হয়। ৩৭০ ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবেই এই ঘোষণা করে আলোচনায় বসলেন সবাই। ভারতীয় জনতা পার্টিই শুধু ৩৭০ ধারা উচ্ছেদের কথা বলে। ছাগলাদ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি বিরল ব্যতিক্রম। কাশ্মীর সম্পর্কে গোড়া থেকে জনসঙ্ঘ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ছিল এবং আছে একথা অন্য দলের নেতারা সবটা না বুঝলেও একটু একটু যে বোঝেন, তার প্রমাণ সবদলের ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধিতা। পতিতাপল্লিতে কোনো সতী সাধ্বী ঢুকে পড়লে সব পতিতা যেমন অস্বস্তিবোধ করে, ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক তেমন অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলকে। ছাগলের খোঁয়াড়ে একটা বাঘের বাচ্চা ঢুকলে যে ধরণের আতংক সৃষ্টি হয় ছাগলদের মধ্যে ঠিক সেইরকম আতংকিত অন্যান্য দলগুলি। অস্থিরতা, আতংক ভারতীয় জনতা পার্টির সত্যকথনে, আদর্শনিষ্ঠায়, ক্রমবর্দ্ধমান জনসমর্থনে। জনগণ দেখতে পাচ্ছে সব দল বাবরের পক্ষে, ভারতীয় জনতা পার্টিই শুধু রামের পক্ষে। এই অন্ধ-নির্বিচার মুসলীম তোষণ জনগণকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে হিন্দু সংগঠনে। সমর্থক করে তুলছে ভারতীয় জনতা পার্টির। জনগণ বুঝতে পারছে কাশ্মীরের ব্যাপারে যেখানে ঘা সেখানে মলমের পটি লাগাবে না কোনো দল। রাশিয়া বলুক, ক্রুশ্চেভ বলুক,পরিস্থিতি আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠুক, ৩৭০ ধারা তারা কিছুতেই তুলবে না তুলতে দেবে না। ঘায়ের তিন ইঞ্চি দূরে ধুয়ে যত্ন করে স্পিরিট দিয়ে সেখানে মলম-পট্টি লাগিয়ে লোককে বোঝাবে চিকিৎসা হচ্ছে। মলম লাগানো হয়েছে। এই স্থূল প্রবঞ্চনা বেশীদিন চলতে পারে না। তাই সারাদেশ আজ পরিবর্তনের মুখে। দেশপ্রেমশূন্য কৌশল সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি জনগণের জমে উঠেছে একবুক ঘৃণা। প্রতিটি ঘটনা এই ঘৃণাকে পুঞ্জীভূত করে তুলছে। অনুন্নত সমাজের মানুষেরা বুঝতে পারছে সংরক্ষণ একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা মাত্র। আগে তাদের শিক্ষায় অগ্রসর করা দরকার। সংরক্ষিত চাকরী শূন্য পড়ে থাকবে শিক্ষা না থাকলে। ভোটের জন্য এই প্রবঞ্চনা করে সমাজের মধ্যে অন্তর্কলহ সৃষ্টির চক্রান্তটি আজ স্পষ্ট।

না চাইতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জামা মসজিদের সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন দিল্লীর ইমামকে। মুলায়েম সিং দিলেন ত্রিশলক্ষ টাকা। আর সময় চেয়ে নিয়ে এদের চারমাসে রামমন্দির নিয়ে একটি বৈঠকের সুযোগ হলো না। আর করসেবার সময় চীৎকার শুরু করে দিল মসজিদ আমরা কিছুতেই ভাঙতে দেবো না। এরা কাদের প্রতিনিধি একথা বুঝতে সমাজ নিশ্চয়ই ভুল করবে না। ভুল করলে ক্ষত আরো গভীর হবে। এখন দুরারোগ্য মনে হচ্ছে তখন নিরারোগ্য মনে হবে। কারণ শয়তানেরা ঘুমোয় না। তারা সতত ক্রিয়াশীল থাকে।

ভি, পি,-র চেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল ছিলেন মুফতি মহম্মদ। রুবাইয়ার নাটক মানুষ এখনও ভোলেনি। তিনি কাশ্মীরে ইতিমধ্যে কি করেছেন এবং করতে চেয়েছেন তার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়। বিপজ্জনক যেসব ব্যক্তিকে জেলখানায় বন্দী রেখে কাশ্মীর অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল বিশ্বনাথ-মুফতি চক্র ক্ষমতায় এসেই তাদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। ভারত বিদ্বেষী হিন্দুবিরোধী পাক অনুচর মারাত্মক এইসব ব্যক্তিদের ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীরের চরম সর্বনাশের কৃতিত্ব এই চক্রের। এই কৃতিত্বের তালিকা দীর্ঘ। মুফতি মহম্মদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবার পর পাকিস্থানের চর বা দালাল বলে পরিচিত পঞ্চান্নজন মুসলমানকে স্বাধীনতা যোদ্ধার তাম্রপত্র দিয়েছেন। শুধু তাম্রপত্র নয় এদের নিয়মিত আর্থিক অনুদানও দেওয়া হবে। এদের মধ্যে আছে বারোজন বিধবা মুসলীম মহিলা। শ্রীনগরের কাঁচগড় মসজিদ অঞ্চলের একটি পরিবারের সাতজন জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী পাওয়া গেছে। এখানকার সোরা নিউ কলোনীর গুলাম আহমেদের এক স্ত্রী এবং তার কিশোর পুত্রকেও এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। অথচ জম্মু-কাশ্মীর সরকারের সুপারিশ করা দুজনের নাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ এরা দুজনেই হিন্দু। মুড়িমুড়কির মত শুধু দেশদ্রোহী মুসলমানদের স্বাধীনতা যোদ্ধার সম্মান দেওয়া হল। এদের দেশদ্রোহী বলা হল না কেন? এইজন্য, অনুসন্ধানে জানা গেছে এরা সকলেই অতীতে জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে গেছে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে। এদের পিছনে ছিল পাকিস্থানী মদত।

অর্থ ও অস্ত্রের জোগান। ভারতের বিরুদ্ধে এরা সরাসরি যুদ্ধ চালিয়ে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী। এ ঘোষণাটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেন ১৯৯০ সালের ২৫শে জানুয়ারী। অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কোন রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নীরব সমর্থন জানিয়েছেন। অথচ অন্নদাশংকর রায় এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি পন্ডিত কাশ্মীরের অর্থনীতি সমাজনীতি নিয়ে চুলের ছাল ছাড়ানো বিশ্লেষণ করেছেন সংবাদপত্রের পাতায়। যার শেষকথা এই অবস্থা চলুক; ৩৭০ ধারা অক্ষত রেখে কাশ্মীরে পাকিস্থানী ধ্বংসসাধন অব্যাহত থাক্। লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু কাশ্মীর থেকে অন্যত্র চলে আসুক। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ভারত ক্রমাগত সর্বনাশ ক্রয় করুক। এই বিচিত্র এবং অদ্ভুত মানসিকতাকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করলে ছাগলদেরই অপমান করা হয়।

এই ছাগলাদ্য রাজনৈতিক নেতারা এবং বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকেরা ১৯৭৫ সালেও একটি ঘটনায় নির্বাক থেকেছিলেন। শেখ আবদুল্লা ৭৫ সালে একটি বিশেষ আইন তৈরী করেছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্য্যন্ত যারা কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য গণভোট আন্দোলনে সামিল হয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্য্যাদা দেওয়া হবে। তাই হলো। পাকিস্থানপন্থী প্লেবিসাইট ফ্রন্টের প্রতিটি সক্রিয় কর্মীকে স্বাধীনতা সংগ্রামী শিরোপা দেওয়া হলো। কোটি কোটি টাকা বিলি করা হলো। এরা প্রত্যেকে ছিল ভারতবিদ্বেষী। গণভোটের দাবী করে এরা ভারতের সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অনেককে হত্যা করেছিল। এর কোনোটাই কিন্তু গোপনে হয়নি। সেদিনও এদেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাক, বুদ্ধিজীবিরা ছিলেন নিশ্চুপ। আটআনা কেজি চাল, একটাকা কেজি চিনি, এম-এ পর্য্যন্ত বিনাপয়সায় পড়ানো, তথাকথিত স্বাধীনতার যোদ্ধাদের জন্য ভারত সরকারের পর্য্যন্ত ব্যয় হয়েছে সত্তর হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এক স্থায়ী সুবিধাভোগী সম্প্রদায় যারা কাশ্মীরকে পরিণত করেছে দেশদ্রোহীদের স্বর্গরাজ্যে। অন্যায় করা এবং অন্যায়কে সমর্থন করা যদি সমান

পাপ হয় তাহলে এদেশের ছাগলাদ্য রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা সমান পাপী। সবাই মিলে এরা তোয়াজ করেছেন শেখ সাহেবকে। যেসব সামরিক ব্যক্তি, পুলিশ কাশ্মীর রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন তাদের সম্মান দেবার আর্থিক সাহায্য দেবার কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ উচ্চারণ করেননি। সেকুলারিজমের নামে পিকিউলিয়ার মানসিকতা আজ জনগণকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার প্রমাণ এইসব ঘটনা তাদের রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়না, বড়জোর চায়ের টেবিলে আলোচনার বিষয় হয়।

এখন অবশ্য দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে জনগণের একটি বড় অংশ। গোন্ডা, মীরাট, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদে যারা দাঙ্গা করতে এসে মারা গেল তাদের একলক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হলো। যারা আত্মরক্ষা করতে গিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে লড়াই করল দেশের আইন তাদের অপরাধী বলে সাজা দিল। এইরকম সেকুলারিজমের পক্ষে যারা, জনগণ তাদের সত্যিই চিড়িয়াখানার নতুন জন্তু দেখার কৌতূহল নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনশীল। এই সরকার হয়ত থাকবে না, দেশের জনগণ থাকবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সতর্ক ও সঠিক থাকলে কোনো সরকার তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কাশ্মীর নিয়ে অতীতের জনসঙ্ঘ বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতির সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা করছে এবং ভারতবর্ষকে নিয়ে সর্বনাশের খেলা খেলেছে। সর্বাধিক ক্ষতি করে দিয়ে গেল ভি, পি, সিং সরকার। বিশেষভাবে স্বরাষ্টমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ। এঁর শেষতম কীর্তি কাশ্মীরের মুজফ্‌ফর বেগকে স্পেশাল এ্যাডভোকেট জেনারেল করার অপচেষ্টা। মুজফফর বেগ কাশ্মীরের একজন উকিল। পাকিস্থানী সমর্থক সন্ত্রাসবাদী মকবুল বাটের মোকদ্দমার ইনি উকিল ছিলেন। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের লন্ডন কার্য্যালয়ে তিনি মাঝে মাঝেই থাকেন। ভারতের আদালত ঔপনিবেশিক আদালত। এখানে কোনো মুসলমান সুবিচার পেতে পারে না এই কথা বলে তিনি মকবুল বাটকে আত্মপক্ষ সমর্থন

করতে নিষেধ করেন। মকবুল মরার আগে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যায় মুজফফর বেগকে। এইরকম একজন গুণী ব্যক্তিকে ভি. পি. সরকার এ্যাডভোকেট জেনারেল করার চেষ্টা করেছেন। কংগ্রেস এবং মার্কসবাদী দলগুলি এই সমস্ত রাষ্ট্রঘাতী কাজের উগ্র সমর্থক। বেদনার কথা এটাই।

আরো বেদনার কথা যারা এদেশের জ্ঞানী গুণী পন্ডিত তারাও যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। অথবা দেখেও দেখছেন না গণতান্ত্রিক দেশে যাদের ফোর্থ এস্টেট বলা হয় সেই সংবাদপত্র গোষ্ঠী, যেন ধৃতরাষ্ট্র সুলভ অন্ধ। বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকেরা গান্ধারীর মত চোখে ফেটি বেঁধে আছেন। সেকুলারিজমের ফেটি। সত্যকে দেখেও তাঁরা বলবেন না। চোখ বন্ধ করে পক্ষ নেবেন দুর্য্যোধনদের। ভারত ভাগের সময়ও এদের একই ভূমিকা ছিল। তাই এদের নয়, জাগতে হবে গণতন্ত্রের শেষকথা জনগণকে। জনগণ দেখতে পাচ্ছে উগ্রপন্থীরা আরো উগ্র হয়েছে। হত্যা এবং অপহরণের ব্ল্যাকমেল চলছে অবাধে। কাশ্মীর যে ভারতের একটি জীবন্ত সমস্যা এটা কোন রাজনৈতিক দল মনে করছে না। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কোটি কোটি দেশবাসী আজ কাশ্মীর বিষয়ে সোচ্চার। তাদের দাবী ঃ যে কোনো মূল্যে ৩৭০ধারার উচ্ছেদ সাধন করে বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে ওখানে বসিয়ে দিতে হবে। পঁচাত্তর হাজার হিন্দু যারা কাশ্মীরে ১৯৪৬ সাল থেকে বাস করেও অবাঞ্ছিত নাগরিক, তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়ে দেশদ্রোহী পোষা বন্ধ করতে হবে। আজাদ কাশ্মীর যা আজ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত তাকে মুক্ত করে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যা ইতিহাস এবং পরিস্থিতি বলছে এবং রাশিয়া ১৯৫৭ সাল থেকে যে পরামর্শ দিয়ে আসছে। এরসঙ্গে মনে রাখতে হবে বিশ্ব ইসলামের পটভূমি। প্যান-ইসলামের নিরবিচ্ছিন্ন মদত। এগুলি বাদ দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা ঘোড়ার আগে গাড়ী বেঁধে চালানোর মতই হাস্যকর।

প্রতিটি সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীর নিয়ে

ছেলেখেলা করেছে। জনগণকে কাশ্মীর সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে জোড়াতালি দিয়ে যে সরকার কেন্দ্রে এলো, তার প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেই ছাগলাদ্য পরম্পরার আউটপুট। ধরেই নেওয়া যেতে পারে তিনি ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করবেন না। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কাশ্মীর নিয়ে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা থাকলে অত রক্তক্ষয় এবং প্রাণাহুতির পরও তাঁরা বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা করতেন না। রামমন্দির আন্দোলন প্রতিরোধে কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় যাদের এত আকুলতা তারা সবাই কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে নিরাসক্ত যোগী কেন? আমানুল্লার মত রাষ্ট্রদ্রোহী পাকিস্থান সরকারের প্রশ্রয়ে পাকিস্থানে থেকে পাকিস্থানের মদত নিয়ে কাশ্মীরে অর্ন্তঘাত চালাচ্ছে। এদেশের সংবাদপত্রে আমানুল্লার সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছে। আমানুল্লা অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন মাননীয় জ্যোতি বসুর। এই প্রশংসার উৎসভূমি কোথায় জনগণের বড় অংশ তা জানেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল কাশ্মীরীরা পৃথক জাতি, অতএব তাদের ভারত থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার আছে। পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিতে **যখন ভারতের সেনাবাহিনী কাশ্মীর পৌঁছাল তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশ জুড়ে শ্লোগান দিয়েছিল ঃ সাম্রাজ্যবাদী ভারত কাশ্মীর থেকে হাত ওঠাও**। কাশ্মীরের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি বলেছিল ভারতীয় দখলদারী ফৌজকে কাশ্মীর থেকে তাড়িয়ে দাও। ১৯৫১-৫২ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি যাঁরা লিখতেন তাঁরা অম্লানবদনে এসব কথা লিখে গেছেন। তাই আমানুল্লা মার্ক্সবাদীদের কিংবা জ্যোতি বাবুর প্রশংসা করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। পৃথিবী জুড়ে মার্ক্সবাদের অপমৃত্যু দেখে অনেকেই আনন্দিত হতে পারেন। ভুলে যাওয়া উচিত নয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে গেলে সব ধ্বংস করে চলে যাওয়ার পোড়ামাটি নীতি মার্ক্সবাদী সোভিয়েটের আবিষ্কার। তাই মার্ক্সবাদীরা শেষ হয়ে যাবার আগে যতটা পারবে ভারতকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। জাতীয় কংগ্রেস কিংবা তার ভগ্নাংশ দলগুলি

কর্কট রোগে আক্রান্ত। রে দিয়ে এ্যাম্পুট করে মৃত্যুর অপেক্ষা করাই এদের ভবিতব্য। এরা নিজেরাই এক একটা সমস্যা। এদের পক্ষে আর দেশের কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেশের অগণিত মানুষ এটা না বুঝলেও দেশদ্রোহীরা এটা বুঝতে পেরেছে। তাই কাশ্মীরে মুসলীম মেয়েরাও এগিয়ে আসছে কাশ্মীরের মুক্তির জন্য। ১৯৮৭তে সক্রিয় হয়েছে দুখ তারন ই মিলাত, ইসলামের কন্যা। এদের সেক্রেটারী নাহিদা সারিণ। এদের সদস্য ন হাজার। সারিণের বক্তব্য ঃ কাশ্মীর এখন নরক। আমরা স্বর্গ বানাবো।

এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলি এর চেয়ে বেশী কিছু করবে না। সুতরাং সব ভাবনা ভাবতে হবে জনগণকে। এখনও সময় আছে। সমাধান দূরে নয়। ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বন্ধক না দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে। যুক্তি বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে বাস্তব সমাধানের কথাগুলি যারা বলছে সেই হিন্দু সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতেই হবে। যে রাজনৈতিক দল ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে, তাদের বিপুল ভাবে নির্বাচনে জয়ী করতে হবে। আর ছাগলাদ্য বুদ্ধিজীবি পন্ডিত এবং রাজনৈতিক দলগুলি যারা কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা পালক পোষক এবং ভারতের সব সমস্যার উৎস, তাদের একবুক ঘৃণা নিয়ে সিফিলিস রোগীর মতো পরিত্যাগ করতে হবে। তবেই অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর শান্ত স্বাভাবিক হবে। অন্যপথের পরিণতি সারা দেশের মানুষের সামনেই রয়েছে।

*****